Personality গ্রন্থে তিনি লেখেন মানুষের মধ্যে যে 'পারসোন্যালিটি' বা ব্যক্তিপুরুষ যা তার একের বোধের চেতনা, যা সকল সম্পর্কের কেন্দ্র তা হচ্ছে সত্য— তা-ই মানুষের পরম অভীষ্ট। এরকম অসংখ্য কেন্দ্র রয়েছে কারণ প্রত্যেক মানুষেরই তার নিজস্ব ছোটো জগৎ আছে যা তার ব্যক্তিপুরুষের সঙ্গে সম্পর্কিত। এ প্রশ্ন আমাদের মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক যে তা হলে সত্য কি বহু, প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির চেয়ে আলাদা ও তারা কি চির-বিরোধী? এর উত্তর সদর্থক হলে আমাদের সমস্ত প্রকৃতি বিদ্রোহ করবে।

> For we know that in us the principle of oneness is the basis of all reality. Therefore, through all his questionings and imaginings from the dim dawn of his doubtings and debates, man has come to the truth, that there is one infinite centre to which all the personalities, and therefore all the world of reality, are related. (Rabindranath Tagore, "The Second Birth", 'Personality', *EWRT*, vol. 2, p. 385).

ভারতীয়দের কাছে মানুষের জীবনের অন্তিম পরিণতি ও সার্থকতা লাভ হয় সকলের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে যার ভিতর দিয়ে সে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

মানুষ যখন অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে নানা অসাড় কর্মের জালে জড়িয়ে পড়ে বা '.....কর্ম যখন স্বার্থের সংকীর্ণতার মধ্যেই কেবল পাক দিতে থাকে তখন কর্ম ভয়ংকর বন্ধন।' ("শক্তি", 'শান্তিনিকেতন', র-র ১২, পৃ. ১৭১)। মানুষের পক্ষে কর্মের বন্ধন ভয়ানক ক্ষতিকর কারণ তার আত্মার সজীবতা নষ্ট হয়ে উপলব্ধি করার ক্ষমতা হারায়। মানুষ মূলত তার নিজের বা পৃথিবীর দাস নয়, সে এক প্রেমিক। প্রেমেই সে মুক্তিলাভ করে এবং প্রেমের যোগেই সকল বস্তুতে যে পরমাত্মা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়। নিজের বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন করতে নিজেকে সে অন্যদের থেকে পৃথক করে পরমাত্মার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। উপনিষদ্ সেই মানুষকে বলেন প্রশান্ত এবং ঈশ্বরের সঙ্গে এক, যে মনুষ্যজীবনের লক্ষ্যবস্তু লাভ করেছে অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এরাই অন্য মানুষ এবং প্রকৃতির সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য বোধ করে ঈশ্বরের সঙ্গে বাধাশূন্যভাবে মিলিত হয়।

যিশুর উপদেশেও আমরা এই সত্যের আভাস পাই যখন তিনি বলেন কোনো ধনী ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে একটি উট স্বচ্ছন্দে সুচের ছিদ্র

Scanned with CamScanner

দিয়ে প্রবেশ করতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে যা-কিছু আমাদের কাছে মহামূল্যবান হয়ে ওঠে তা-ই অন্যের কাছ থেকে আমাদের পৃথক করে; আমাদের সম্পদ আমাদের সীমাবদ্ধতা তৈরি করে আধ্যাত্মিক জগৎ বা পূর্ণ সামঞ্জস্যের জগতে পৌঁছোতে দেয় না।

তাই উপনিষদের শিক্ষার তাৎপর্য হচ্ছে, তাঁকে পাবার জন্য সকলকে গ্রহণ করতেই হবে। ধনসম্পদ লাভ করতে গিয়ে আমরা কয়েকটি জিনিস অধিকার করার জন্য সকল কিছুকেই ত্যাগ করেছি; যিনি পূর্ণ তাঁকে পাবার সঠিক উপায় এটি নয়।

'সাধনা'-য় রবীন্দ্রনাথ যাঁকে 'Eternal Spirit', 'all-pervading Spirit' বা 'God' বলেছেন তিনিই উপনিষদ্-কথিত ব্রহ্ম।[৫] এই ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু ইউরোপীয় দার্শনিকের ধারণা যে ব্রহ্ম নৈর্ব্যক্তিক কারণ পরমাত্মাকে অধিবিদ্যার বাইরে আর পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের মতে অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিক অবশ্য এভাবে ব্রহ্ম সম্বন্ধে চিন্তা করেন না, তাঁরা সর্বজগৎকে ব্রহ্মময় জ্ঞানে জানেন এবং সর্ববস্তুতে তাঁকে উপলব্ধি করে প্রণাম জানান। 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধাবলিতে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মকে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ রায়-সম্পাদিত 'দর্শনচিন্তা'-য় আমরা দেখি, '..... 'শান্তিনিকেতন' ভাষণের ঈশ্বর দূরের, তিনি ব্রহ্ম; তাঁকে পিতা বলে' সম্বোধন করি বটে, কিন্তু আসলে তিনি ব্যক্তিগত সম্বোধনের সীমানায় বাঁধা নন।' ('রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ', পৃ. ৭২)। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের এই ব্রহ্মকে 'সাধনা' গ্রন্থে গ্রহণ করেছেন যদিও 'গীতাঞ্জলি'-র ঈশ্বরকে তিনি অনেক ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছেন।

'সাধনা' ভাষণাবলিতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় বুদ্ধের প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন বুদ্ধদেব উপনিষদের ব্যবহারিক দিকটিকে কেন্দ্র করে একই ধরনের মত ব্যক্ত করেছেন। বুদ্ধ যে ব্রহ্মবিহারের কথা বলেছেন তা রবীন্দ্রনাথ এইভাবে অনুবাদ করেছেন :

> যখন দাঁড়িয়ে আছ বা চলছ, বসে আছ বা শুয়ে আছ, যে পর্যন্ত না নিদ্রা আসে সে পর্যন্ত এই প্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকে ব্রহ্মবিহার বলে।
> অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে

Scanned with CamScanner

ব্রহ্মবিহার বলে। সে প্রীতি সামান্য প্রীতি নয় — মা তাঁর একটিমাত্র পুত্রকে যেরকম ভালোবাসেন সেইরকম ভালোবাসা।[৬]

("ব্রহ্মবিহার", 'শান্তিনিকেতন', র-র ১২, পৃ. ২৫০)।

ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে এভাবে পেয়ে এবং প্রতিনিয়তই পেতে থাকাকে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবিহার বলেছেন। এই পাওয়া কখনোই অনায়াসলব্ধ নয়, 'এত বড়ো লাভের খুব একটা বড়ো সাধনা নেই কি?' ("সাধন", তদেব, পৃ. ২৪৪)। তিনি ঈশ্বরকে তপস্যার মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে জানার কথা বলেছেন এবং সেই জানার মধ্য দিয়েই ব্রহ্মবিহার করা সম্ভব। তিনি বিষয়টি বোঝানোর জন্য সমাজবিহারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সমাজে পাঁচজন মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবার জন্য মানুষকে নানাভাবে শিক্ষালাভ করতে হয়েছে। পিতা-মাতার কাছে শিক্ষা, প্রতিবেশী, বন্ধু, শত্রু সকলের থেকে শিক্ষালাভ, তারপরে ইস্কুল ও অফিসে শিক্ষা। সমাজবিহারের জন্য মানুষ যদি এই কঠিন ও নিরলস সাধনা করতে পারে, 'তবে ব্রহ্মবিহারের জন্য বুঝি কেবল মাঝে মাঝে নিয়মমত দুই-চারিটি কথা শুনে বা দুই-চারিটি কথা বলেই কাজ হয়ে যাবে?' ("সাধন", তদেব, পৃ. ২৪৫)। যে কথা মানুষকে সর্বদা মনে রাখতে হবে তা হচ্ছে তার সকল কাজের মধ্যে এই সাধনাকে জাগিয়ে রাখা। তার শরীর মন ও হৃদয়কে নিযুক্ত করে ব্রহ্মবিহারের অভীপ্সায় সাধনা করে যেতে হবে। 'এই - যে আত্মা দিয়ে বিশ্বের সর্বত্র আত্মার মধ্যে প্রবেশ করা এই তো আমাদের সাধনার লক্ষ্য। প্রতিদিন এই পথেই যে আমরা চলছি এটা তো আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। অন্ধভাবে জড়ভাবে তো এটা হবে না। চেতনভাবেই তো চেতনার বিস্তার হতে থাকবে।' ("আত্মার সৃষ্টি", 'শান্তিনিকেতন', পৃ. ১০৪)।

রবীন্দ্রনাথের উপর বৌদ্ধদর্শনের প্রভাব প্রসঙ্গে এখানে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। বুদ্ধের বাণী ও নীতিতে রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হন এবং তাঁর বিভিন্ন রচনায় তিনি তা প্রায়ই উল্লেখ করেছেন।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'ধম্মপদ'-এ বুদ্ধের যে বাণী ও নীতি প্রকাশিত হয়েছে সে সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বৌদ্ধধর্ম' (পৃ. ১৩৮) গ্রন্থে বলেছেন, 'ইহাতে (ধম্মপদে) যে-সকল ধর্মপ্রবচন ও হিতোপদেশ আছে, আমাদের মহাভারত গীতা এবং অন্যান্য নীতিশাস্ত্রে তাহার অনুরূপ কথার অপ্রতুল নাই, কতক বিষয়ে

Scanned with CamScanner

অবিকল সাদৃশ্যও উপলক্ষিত হয়।' (প্রবোধচন্দ্র সেন, 'ধম্মপদ পরিচয়', পৃ. ১৭)। এ কারণেই হয়তো রবীন্দ্রদর্শন উপনিষদ্ ভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে বৌদ্ধদর্শনের প্রভাব যথেষ্ট লক্ষ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিজীবনের কথা "আত্মপরিচয়" শীর্ষক আত্মজীবনীমূলক রচনায় বলেছেন, 'তা শুধু এই জন্মের নয় তা বহু জন্মের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত।' এই কবিজীবন তাঁর জীবনদেবতা দ্বারা রচিত এবং তিনি বলেন, '.....অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে।' (র-র ১০, পৃ. ১৭০)।

শিশিরকুমার দাশ মনে করেন রবীন্দ্রনাথের 'এই বোধ হিন্দু-বৌদ্ধ জন্মান্তরবাদের সঙ্গে জড়িত.....।' (শিশিরকুমার দাশ, 'আত্মজীবনী : জীবনী ও রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ২২)।

বুদ্ধের মৌলিক সিদ্ধান্ত হল যে জগৎ দুঃখময় এবং দুঃখের বিনাশ কাম্য। রবীন্দ্রদর্শনেও দুঃখ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দুঃখের বিনাশ চাননি, কারণ দুঃখের মধ্য দিয়ে গিয়েই মানুষের আত্মশুদ্ধি ঘটে। তাই দুঃখকে পরিহার করা নয়, দুঃখ বরণীয়, দুঃখই পারে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের বোধ জাগ্রত করতে।

'সাধনা' গ্রন্থের অন্যত্র তিনি প্রেমের ভিতর দিয়ে অসীমকে উপলব্ধি করার কথা বলেছেন, যার পিছনেও রয়েছে বুদ্ধের মৈত্রীভাবনা বা মেত্তিভাবনা। প্রেমের ভিতর দিয়ে অসীমকে লাভ করা সম্ভব কারণ প্রেম সকলের উর্ধ্বে। আত্মা ক্রমান্বয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে যখন তার মধ্যে প্রেমের ভাব জাগে। বুদ্ধ আত্মার এই অবস্থায় পৌঁছোনোর সাধন বলে দিয়েছেন — তা হচ্ছে শীল গ্রহণ ও শীল সাধনা।[৮] শীল সাধনার দ্বারা মৈত্রীকে অবাধে বিস্তার করা যায়। মানুষ যখন তার অপরিমিত মিত্রতা ও সম্প্রীতির দ্বারা নিজেকে বিশ্বলোকে অভিব্যক্ত করে তা হয় তার ব্রহ্মবিহার। ব্রহ্মবিহার বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে ব্রহ্মের '.....মানসের সঙ্গে মানস, প্রেমের সঙ্গে প্রেম' ("বুদ্ধদেব", র-র ১১, পৃ. ৪৭৭) মেশাতে হবে অর্থাৎ ব্রহ্মের বিহারক্ষেত্রে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন হবে।

Scanned with CamScanner